তার আগে চাই গণতন্ত্র

প্রভাষ আমিন

গণতন্ত্র নিয়ে অনেক কথা আছে। আলোচনা আছে, সমালোচনা আছে। তারপরও বিদ্যমান সবগুলো ব্যবস্থার মধ্যে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। মানুষের মৌলিক চাহিদা বলা হয় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানকে। এরপর আসে শিক্ষা ও চিকিৎসার কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের মৌলিকতম চাহিদা বা অধিকার হলো; বলতে পারা, বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। পছন্দ-অপছন্দ, ভালো-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া জোর গলায়, চিৎকার করে বলতে পারা, বেছে নিতে পারাটাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় চাওয়া। আপনি উন্নয়নে ভাসিয়ে দেন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা দেন, ঘর বানিয়ে দেন, শিক্ষা দেন, চিকিৎসা দেন; লাভ নেই। সাঁতার না জানা শহুরে ভদ্রলোকের মতো আপনার জীবনের ষোলো আনাই মিছে।

তবে অনেকদিন ধরেই গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারণাটি নিয়ে আমার মধ্যে সংশয় তৈরি হচ্ছে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারণা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের, 'অফ দ্যা পিপল, বাই দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল।' সবকিছুই জনগণের জন্য, এ ধারণার সঙ্গে আমি একশো ভাগ একমত। তবে সবকিছু, সবসময় জনগণের দ্বারাই হতে হবে কি না, এ নিয়ে আমার দ্বিমত তৈরি হচ্ছে। স্ববিরোধী মনে হতে পারে। তবে আমি নিজে একজন চূড়ান্ত গণতন্ত্রী মানুষ। আমি চাই, সব দেশের, সব সরকারের সব করণীয় যেন সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য হয়। আমি সবসময় ভিন্নমতকে স্বাগত জানাই, সব মতকে ধারণ করে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজের বিকাশ চাই। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িনি। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বইয়ে কী লেখা আছে জানি না। কিন্তু সাধারণভাবে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে কোনো কিছু পরিচালনা করা। সেটা রাষ্ট্র হোক বা কোনো সংগঠন হোক। কিন্তু আমাদের দেশে গণতন্ত্রের জন্য যারা বছরের পর বছর লড়াই করছে, সেই রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র কতটা ধারণ করে; তা নিয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ মানেই শেখ হাসিনা, বিএনপি মানেই খালেদা জিয়া। এখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই।

রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্রের ধারণাটিই এখন বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয়। আমরাও বিশ্বাস করি, সবচেয়ে খারাপ গণতন্ত্রটাও অন্য যে কোনো ব্যবস্থার চেয়ে ভালো। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রাথমিক ধারণাটাই ত্রুটিপূর্ণ। বাংলাদেশে সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। বিভিন্ন দেশে মেয়াদের রকমফের থাকলেও নির্বাচনের ধরনটা একই। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দলের কাছে দেশকে মোটামুটি পাঁচ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়ে যায়। কোনোরকমে একটা নির্বাচন করে ফেলতে পারলে পরের পাঁচ বছর বৈধতার বাতাবরণে তাদের যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার জন্মে যায় এবং কখনো কখনো তা করেও। এর জবাবে গণতন্ত্রপন্থিরা বলেন, খারাপ কাজ করলে জনগণ জবাব দেবে। কিন্তু জবাব দেওয়ার জন্য তো জনগণকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। আর এই পাঁচ বছর যদি সেই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাহলে জনগণ কী করবে? এর কোনো রক্ষাকবচ প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারণায় নেই।

অনেকে বলতে পারেন, সরকার গণবিরোধী কাজ করলে জনগণ রাজপথে নেমে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার কি রাজপথের আন্দোলনে পতন ঘটে, না ঘটানো উচিত? কোন মাত্রার আন্দোলন হলে, সেটা সরকার পতনের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে? বাংলাদেশে সরকার গঠিত হলো, ধরুন ৩ কোটি লোকের ভোটে। কিন্তু পাঁচ লাখ লোক ঢাকার রাস্তায় আন্দোলন করলেই তো মনে হবে, গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেছে। এখন তিন কোটি লোকের ভোটে গঠিত সরকার কি পাঁচ লাখ লোকের আন্দোলনে পদত্যাগ করবে, না করা উচিত? তাই আন্দোলনের আশায় বসে থেকে লাভ নেই। আসলে গণতন্ত্র মানে পাঁচ বছরের জন্য একটি দল বা সরকারের কাছে দেশকে জিম্মি করে ফেলা।

গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মত। শুনতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কি সবসময় ভালোটা বেছে নিতে পারে? পারে না। পারে যে না, তার অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যাবে। ভালো হোক, মন্দ হোক; জনগণের রায় সবাইকে মেনে নিতে হবে, এটাই গণতন্ত্রের মূল কথা। কিন্তু জনপ্রিয় রায় কি সব সময় কল্যাণকর? জনপ্রিয় সবকিছু কি সবসময় ভালো? সবকিছু কি জনগণের রায়ের ওপর নির্ভর করে করা সম্ভব না করা উচিত? জনপ্রিয় সিনেমা মানেই ক্ল্যাসিক নয়, জনপ্রিয় উপন্যাস মহৎ সাহিত্য না-ও হতে পারে। সবকিছু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে করা হলে অনেক আগেই বিশ্ব থেকে সংখ্যালঘুরা হারিয়ে যেতো।

যেমন ধরুন, বাংলাদেশে চাকরির কোটা থাকা না থাকা প্রশ্নে বেশিরভাগ মানুষ কোটার বিপক্ষে থাকবে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগকে পুঁজি করে ব্যাপক আন্দোলনে কোটা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু অবহেলিত, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়াতেই কোটা ব্যবস্থার প্রচলন। একটি সভ্য দেশ কখনো কোটামুক্ত থাকতে পারে না। কোটা না থাকা মানে জঙ্গলের দেশ। বাংলাদেশে গণভোট হলে ক্রসফায়ারের পক্ষেও বিপুল জনরায় পাওয়া যেতে পারে। অন্তত শুরুর দিকে ক্রসফায়ার খুব জনপ্রিয় ছিল। এই জনপ্রিয়তার জোরেই সরকারগুলো দিনের পর দিন ক্রসফায়ারের নামে মানুষ হত্যা করতে পেরেছিল।

গণতন্ত্রে এক ধরনের প্রতারণাও আছে। নির্বাচনের আগে জনগণের সামনে সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভব অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। নির্বাচনের পর রাজনীতিবিদরা যা ভুলে যান। যেমন বাংলাদেশে নির্বাচন এলেই সবাই খুব ধার্মিক হয়ে যান। কোন দল ক্ষমতায় গেলে মসজিদে আজানের বদলে উলুধ্বনি হবে, কোন দল ক্ষমতায় গেলে মদিনা সনদে দেশ চালাবে; এ নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা হয়। ভুল প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেকে নির্বাচনে জিতেও যান। কিন্তু জিতে যাওয়ার পর প্রতিশ্রুতি পূরণ না করলে জনগণ কী করবে? ভুল প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে কি নির্বাচনের ফলাফল বদলে যাবে?

গণতন্ত্রের আরেকটা বড় ত্রুটি হলো, যার কাছে টাকা বেশি, নির্বাচনী প্রচারণায় যিনি বেশি খরচ করতে পারেন, তার জয়ের সম্ভাবনা বেশি। তাই যৌক্তিক অবস্থানে থেকেও অনেকে ট্যাক দুর্বল থাকলে হেরে যেতে পারেন। বাংলাদেশে ড. কামালরা বারবার হেরে যান খালেকদের কাছে। এটাই গণতন্ত্রের দুর্বলতা। তৃতীয় বিশ্বে অর্থের সঙ্গে যোগ হয় অস্ত্র, পেশীশক্তি। অর্থ আর অস্ত্র গণতন্ত্রের রায় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আগেই বলেছি, সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রের অনেক সমস্যা আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভুল কাউকে বেছে নিলেও সেটা মেনে নিতে হয়। অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি একজন খারাপ মানুষও ভোটে জিতে যায়, পাঁচ বছর তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাংলাদেশের সংসদগুলোর দিকে তাকালে এমন হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যাবে।

আবার ধরুন, কোনো এক নির্বাচনে পাঁচজন প্রার্থী। একজন পেলেন ৩০ ভাগ ভোট। বাকি চারজন মিলে পেলেন ৭০ ভাগ ভোট। এককভাবে ৩০ ভাগ ভোট পাওয়া ব্যক্তিটিই কিন্তু নির্বাচিত হবেন। তার মানে ৭০ ভাগ মানুষ যার বিপক্ষে, তিনিই কিন্তু নির্বাচিত হয়ে গেলেন। কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামে এক স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সব প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হলো। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া ব্যক্তি নির্বাচিত হলেন। তারমানে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া ব্যক্তিই হলেন জনপ্রতিনিধি।

সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক চেতনা এক নয়। এই যেমন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক হলেও কোনো দলেই গণতন্ত্র নেই। আওয়ামী লীগে শেখ হাসিনা আর বিএনপিতে বেগম খালেদা জিয়াই শেষ কথা। এ নিয়ে আমরা অনেক সমালোচনা করি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যতবার ভোট হবে, ততবারই তো নিজ নিজ দলে হাসিনা বা খালেদাই জিতবেন। তাহলে কি প্রতিবার ভোটের আয়োজন করতে হবে? হলে ভালো, না হলেই যে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে, তা নয়। গণতান্ত্রিক চেতনাটাই আসল।

সম্প্রতি গবেষক মহিউদ্দিন আহমদের একটি লেখায় বাংলাদেশে 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হিসেবে পরিচিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রসঙ্গে একটি কথা পড়ে চমকে গেছি। উদ্ধৃত করছি "১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি সোহরাওয়ার্দী দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিপরিষদে যোগ দিয়েছিলেন। মন্ত্রিত্ব নেওয়ার পর এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ আবার কী? আমিই আওয়ামী লীগ।' সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো বিরোধী না?' সোহরাওয়ার্দীর জবাব ছিল, 'আমিই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো।" এই হলো আমাদের গণতন্ত্রের মানসপুত্রের গণতান্ত্রিক চেতনা! এটা মোটেই গণতন্ত্র নয়।

আবার শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে নির্বাচনে ভূমিধ্বস জয় পাওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, 'বিরোধী দলকে আমি সংখ্যা দিয়ে গুণবো না।' যদিও শেখ হাসিনা পরে তাঁর এই অঙ্গীকারে স্থির থাকেননি বা থাকতে পারেননি। তবে এটাই হলো গণতন্ত্রের আসল চেতনা। তবে আমি গণতন্ত্রের শেষ কথা মানি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের একটি লাইনকে, 'আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো, এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি হয় সে, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।' এটাই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র মানে নিছক সংখ্যারিষ্ঠতা নয়, গণতন্ত্র হলো ন্যায্যতা, গণতন্ত্র মানে জনগণের কল্যাণ।

তবে সবসময় কল্যাণেও সন্তুষ্ট হয় না জনগণ। গত ১৪ বছরে দেশে দারুণ স্থিতিশীলতা রয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুযোগে দেশের অর্থনীতি এগিয়েছে দারুণ গতিতে। অর্থনীতি ও সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অর্জন অবশ্যই আমাদের গর্বিত করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে উন্নয়ন টেকসই হয় না। আমরা টেকসই উন্নয়ন চাই, তবে তার আগে চাই গণতন্ত্র।